বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল: ভারতের অভিজ্ঞতার একটি স্ন্যাপশট

মাহা মির্জা

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা স্পেশাল ইকনমিক জোন (সেজ) ভারতে বৃহৎ পুঁজির পক্ষে রাষ্ট্রের আগ্রাসী ও নিপীড়নমূলক তৎপরতার একটি নাম। কৃষিজমি দখল, 'আইন' ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ উচ্ছেদ, বৃহৎ কোম্পানির হাতে বিপুল পরিমাণ জমি তুলে দেয়ার এই প্রক্রিয়া রাষ্ট্র-বৃহৎ পুঁজি আঁতাতের অন্যতম উদাহরণ। বাংলাদেশেও এই ধারা ক্রমে জোরদার হচ্ছে। বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে এই 'উন্নয়ন' তৎপরতার মূলদিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

নব্বইয়ের শুরুতে ভারতে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ কমে এলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দুর্বল অবকাঠামো, সরকারি দুর্নীতি, কঠোর শ্রম আইন, নীতিমালা প্রণয়নের দীর্ঘসূত্রতা, বিনিয়োগ অবান্ধব পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়কে আমলে নিয়ে বিদেশি এবং বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরিকল্পনা করা হয়। বস্তুত: এশিয়া মহাদেশের প্রথম বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলটি স্থাপিত হয় ১৯৬৫ সালে ভারতের কান্ডালায়। বর্তমানে কয়েক'শর বেশি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চালু আছে। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় সরকার ছয়'শর ওপর বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন দিয়েছে। বিশেষ করে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরপরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ব্যক্তিগত উদ্যোগে নতুন করে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের কার্যক্রম শুরু করার উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেন।

সাধারণত রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত হলেও প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আইন বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য হয় না। বরং এই বিশেষ অঞ্চলগুলো প্রচলিত আইনকে পাশ কাটিয়ে বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকে। যেমন– দেশীয় বিভিন্ন শিল্প খাত করের আওতায় থাকলেও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের কার্যক্রম সাধারণত প্রায় এক দশক সময় ধরে রাষ্ট্রীয় করের আওতামুক্ত থাকে। আবার রাষ্ট্রের সংবিধানে ট্রেড ইউনিয়ন করার স্পষ্ট বিধান থাকলেও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন করার অনুমোদন নেই। এভাবে বিনিয়োগ, ব্যবসা, কর, কাস্টম, কোটা, শ্রমিক সম্পর্ক ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের উর্ধ্বে থাকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এই বিশেষ অঞ্চল। এ ছাড়াও ন্যূনতম খরচে বিদ্যুৎ সংযোগ ও পানির সরবরাহ ছাড়াও শিল্প এলাকা সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণের কাজটিও রাষ্ট্রীয় খরচেই করে দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য, ভারতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের উদ্দেশ্যে কৃষিজমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে দীর্ঘদিনের গণপ্রতিরোধ। প্রশ্ন উঠেছে এইসব অর্থনৈতিক অঞ্চলকে দেয়া বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা নিয়েও। এই প্রেক্ষাপটে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ভিত্তিক এই তথাকথিত 'উন্নয়ন' মডেলকে প্রশ্ন করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমানে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল মানেই বৈদেশিক বিনিয়োগ, আর বৈদেশিক বিনিয়োগ মানেই উন্নয়ন– এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ একের পর এক অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই মোট তিনটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের কার্যক্রম চালু আছে। সম্প্রতি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশের মংলা ও ভেড়ামারায় দুটি ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। এরকম একটা প্রেক্ষাপটে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বিষয়ক ভারতের অভিজ্ঞতা এ লেখাটিতে মূলত আলোচনা করা হবে:

জমির প্রাপ্যতা

সাধারণত ঘনবসতিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলকে বরাদ্দ দেয়ার মতো খালি জমি পড়ে থাকে না। ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ হয়েছে উর্বর কৃষিজমি। কৃষিজমিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন মানেই বিপুলসংখ্যক কৃষককে তাদের জমি ও জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করা। গত চল্লিশ বছরে বিপুল পরিমাণ কৃষিজমি শিল্পায়ন এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে মোট ৭০০০ বর্গকিলোমিটার কৃষিজমি অকৃষি খাতে বরাদ্দ হয়। ২০০৫-০৬-এ এসে দেখা গেছে, নগরায়ণ, শিল্প এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হয়েছে ১৪০৬৯ বর্গকিলোমিটার কৃষিভিত্তিক এলাকা, যা ষাটের দশকের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। যদিও ভারতের তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী শিল্প খাতকে আহ্বান জানিয়েছিলেন বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্যে উর্বর জমি অধিগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে, কিন্তু লক্ষণীয়, বাংলাদেশ ও ভারতের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে উর্বর ও অনুর্বর জমি সাধারণত পাশাপাশিই অবস্থিত। সংরক্ষিত বনভূমি বা পাহাড়ি এলাকা ছাড়া বিপুল পরিমাণ অনুর্বর জমির প্রাপ্যতা সাধারণত আলাদাভাবে নিশ্চিত করা প্রায় অসম্ভব।

ভূমি অধিগ্রহণ আইন বিতর্ক: জনস্বার্থে অধিগ্রহণ না অন্য কিছু?

১৮৯৪ সালে গৃহীত এবং এখনো বলবৎ ভারতীয় ভূমি অধিগ্রহণ আইনের আওতায় ভারতীয় রাষ্ট্র বাধ্যতামূলকভাবে ব্যক্তিমালিকানায় থাকা জমি 'পাবলিক পারপাস' বা জনস্বার্থমূলক কাজে ব্যবহারের জন্য অধিগ্রহণ করতে পারে। তবে 'জনস্বার্থে'র কোনো পরিষ্কার ব্যাখ্যা না থাকায় ভারতে দীর্ঘদিন ধরেই এ আইনের যত্রতত্র ব্যবহার দেখা গেছে। জনস্বার্থের অজুহাতে এবং রফতানিমুখী উৎপাদন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বা বৈদেশিক বিনিয়োগের দোহাই দিয়ে ভারতে গত দুই দশকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, যা পরবর্তী সময়ে সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য, অতি সম্প্রতি ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়কে কেন্দ্র করে বিতর্ক ছড়িয়ে পড়েছে ভারতীয় ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট বা ভূমি অধিগ্রহণ আইনের বিরুদ্ধে।

ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের এ রায় অনুযায়ী বৈদেশিক বিনিয়োগ, বৈদেশিক মুদ্রা, কর্মসংস্থান বা রাষ্ট্র এবং জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করবে এমন সকল প্রকল্পই জনস্বার্থ বা 'পাবলিক পারপাসে'র আওতায় পড়বে। উল্লেখ্য, এ রায়টি ভারতীয় ভূমি অধিগ্রহণ আইনের সেকশন ৩/এফের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। মূল আইনটিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে, ব্যক্তিমালিকানার ভূমি বেসরকারি বাণিজ্যিক কোম্পানির মুনাফা লাভের জন্য অধিগ্রহণ করা হলে সেটি কোনোরূপেই 'জনস্বার্থ' হিসেবে বিবেচিত হবে না। এ ছাড়াও ১৮৯৪ সালে গৃহীত ভূমি অধিগ্রহণ আইনের একটি ধারায় জমি অধিগ্রহণকালে এলাকার শতকরা ৭০ ভাগ কৃষকের সম্মতি নেয়ার বিধান থাকলেও ২০১৪ সালের সংশোধিত 'ল্যান্ড বিল' অনুযায়ী, শিল্প খাত ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রকল্প, গ্রামীণ অবকাঠামো, গৃহায়ণ ও প্রতিরক্ষা– এই পাঁচ খাতে কৃষকের সম্মতি ছাড়াই জমি অধিগ্রহণ করার বিধান রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এই সংশোধনীর মাধ্যমে বেসরকারি কোম্পানির মুনাফাকেন্দ্রিক স্বার্থকেও 'পাবলিক পারপাস' বা জনস্বার্থ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

বলাই বাহুল্য, আদালতের এই রায়ের একচেটিয়া উপকারিতা ভোগ করবে ব্যবসায় শ্রেণি এবং কর্পোরেট হাউসগুলো। আবার বিপুলসংখ্যক কৃষককে কোনো রকমের আইনি মারপ্যাঁচ ছাড়াই উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে ভারতীয় রাষ্ট্র বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের দোহাই দিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জমি কবজা করে তা কর্পোরেট হাউসগুলোর হাতে স্থানান্তর করার প্রক্রিয়াটিকে আইনি বৈধতা পেয়েছে মাত্র।

ক্ষতিপূরণ

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র বা কোম্পানির পক্ষ থেকে এমন যুক্তি দেওয়া হয় যে, বরাদ্দকৃত এলাকার কৃষক বা আদিবাসীদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মাধ্যমেই জমি অধিগ্রহণ করা হয়। কিন্তু বাস্তবে কৃষকের কাছে একখণ্ড জমি তার এবং তার পরবর্তী প্রজন্মের উপার্জনের একমাত্র সম্বল হওয়ায় কৃষককে বাজারদরের ওপর ভিত্তি করে কৃষিজমির এককালীন ক্ষতিপূরণ দেওয়া আদৌ ন্যায়সংগত নয়। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, ভারতের বেশির ভাগ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, কৃষকরা ক্ষতিপূরণের প্রসঙ্গ আসার আগেই আন্দোলনে নেমেছে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে টাটার মোটর কারখানা স্থাপনের উদ্যোগের সময় দেখা গেছে, গ্রামবাসীরা ক্ষতিপূরণ নিয়ে আলোচনা করতেই আগ্রহী ছিল না। পসকো স্টিল প্রকল্পের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, জোরপূর্বক জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদস্বরূপ কৃষকরা ৩৪টি ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ জনসমক্ষে পুড়িয়ে ফেলেছে। নিয়মগিরির ভেদান্তা বক্সাইট খনির ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, এলাকার ডংড়িয়া আদিবাসীরা 'জীবন দেবেন কিন্তু পাহাড় দেবেন না' এই প্রতিজ্ঞা করেই আন্দোলনে নেমেছে। মহারাষ্ট্রের গড়াই অঞ্চলে 'ট্যুরিস্ট-এসইজেড' করার উদ্যোগ নেওয়া হলে আন্দোলনরত কৃষক এবং জেলেদের ক্ষতিপূরণ বাড়িয়ে দেবার আশ্বাস দেয়া হলেও আন্দোলনকারীরা সেই প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি। মহারাষ্ট্রের রাইগড়ে রিলায়্যান্স গ্রুপ এলাকার কৃষকদের একরপ্রতি নগদ ২০০০০ ডলার এবং একটি করে চাকরির প্রস্তাব দিলেও কৃষকদের রাজি করানো যায়নি। এখানে পরিষ্কার যে, কৃষিজমির ক্ষতিপূরণ নগদ অর্থে দেয়া সম্ভব নয়। এবং কৃষকরাও তাদের বংশানুক্রমিক জীবিকা ছেড়ে শিল্পকারখানার শ্রমিক হতে আগ্রহী হয় না।

গুরগাঁও ও বোম্বেতে রিলায়্যান্স গ্রুপের দুটি এসইজেড প্রকল্প, গোয়ার প্রায় সবগুলো এসইজেড এবং মহারাষ্ট্রের চারটি এসইজেড গ্রামবাসীদের আন্দোলনের মুখে বাতিল করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। এছাড়া প্রবল প্রতিরোধের মুখে ওড়িশার উপকূলীয় অঞ্চলে ভারতের সর্ববৃহৎ বৈদেশিক বিনিয়োগ বলে খ্যাত পসকোর ১২টি স্টিল কারখানার কাজ ২০০৫ সাল থেকে বন্ধ আছে। টাটার ন্যানো গাড়ির কারখানা কৃষকের প্রতিরোধের মুখে শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে গুজরাটে স্থানান্তর করা হয়েছে।

স্থানীয় অর্থনীতি

ভূমি অধিগ্রহণের এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এলাকার বর্গাচাষি ও ক্ষেতমজুর। জমির মালিক কৃষক ক্ষতিপূরণ পেলেও ভূমিহীন কৃষক আইনত ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে না। তাই এলাকার ক্ষেতমজুর ও বর্গাচাষিরা এই ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে যায়। জমি কোম্পানির হাতে চলে যাওয়ায় ভূমিহীন ক্ষেতমজুর হারায় কর্মসংস্থানের একমাত্র সুযোগ। এ ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষিজমির ব্যবহার বহুমুখী। শুধুমাত্র প্রধান প্রধান ফসলই নয়, গ্রামাঞ্চলের মানুষ কৃষিজমি থেকেই পায় গবাদি পশুর খাদ্য, বিভিন্ন ঔষধি গাছ এবং অন্যান্য খাদ্য। ফসলের মাধ্যমে অন্যান্য পণ্যের লেনদেনও স্বাভাবিক। এ ছাড়াও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য কেবল অনুর্বর জমিই অধিগ্রহণ করা হয় বলে দাবি করা হলেও এই তথাকথিত অনুর্বর জমি স্থানীয় জনগণের জ্বালানির উৎস এবং গবাদি পশুর চারণভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অনুর্বর জমি সাধারণত এলাকার পানি ব্যবস্থাপনার কাজেও ব্যবহৃত হয়। ফলে শিল্প অঞ্চলের জন্য যে কোনো 'বাড়তি' জমি বা অনুর্বর জমি অধিগ্রহণ করা হলেও স্থানীয় অর্থনীতি এবং স্থানীয় এলাকার জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে তা হুমকির মধ্যে ফেলে দেয়।

কর্মসংস্থানের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি

এমন একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, জমি অধিগ্রহণের ফলে যে অঞ্চলের কৃষক উচ্ছেদ হয় তারা পরবর্তী সময়ে ওই শিল্প অঞ্চলে গড়ে ওঠা কারখানাতেই চাকরি পায়। এটি আদতে একটি মিথ। কৃষক ও শ্রমিকের দক্ষতা বা স্কিল এক নয়। কৃষককে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করা হলেও পরবর্তীতে দেখা যায়, চাকরি দেওয়া হয় অন্য এলাকা থেকে আগত দক্ষ শ্রমিকদের। অনেক ক্ষেত্রেই পুনর্বাসন প্যাকেজে পরিবারপ্রতি একটি চাকরির প্রস্তাব থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা এসএসসি পাস নির্ধারণের কারণে অধিকাংশ কৃষক পরিবারের সদস্যদের শিল্প অঞ্চলে চাকরি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না।

গণপ্রতিরোধ এবং সফলতা

রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের কারণে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা গণপ্রতিরোধ সব ক্ষেত্রে সফল না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তুমুল আন্দোলনের মুখে এইসব প্রকল্প বাতিল হয়েছে। গুরগাঁও ও বোম্বেতে রিলায়্যান্স গ্রুপের দুটি এসইজেড প্রকল্প, গোয়ার প্রায় সবগুলো এসইজেড এবং মহারাষ্ট্রের চারটি এসইজেড গ্রামবাসীদের আন্দোলনের মুখে বাতিল করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। এছাড়া প্রবল প্রতিরোধের মুখে ওড়িশার উপকূলীয় অঞ্চলে ভারতের সর্ববৃহৎ বৈদেশিক বিনিয়োগ বলে খ্যাত পসকোর ১২টি স্টিল কারখানার কাজ ২০০৫ সাল থেকে বন্ধ আছে। টাটার ন্যানো গাড়ির কারখানা কৃষকের প্রতিরোধের মুখে শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে গুজরাটে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ ছাড়াও ওড়িশায় লন্ডনভিত্তিক খনন কোম্পানি ভেদান্তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠলে রাজ্য সরকার ভেদান্তার সঙ্গে বক্সাইট খনন প্রকল্প বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা ভারতীয় জনগণের এই প্রবল প্রতিরোধ এটাই প্রমাণ করে যে, এ ধরনের উন্নয়ন মডেল মূলত কর্পোরেট-বান্ধব এবং গণবিরোধী।

কৃষি বনাম শিল্প বিতর্ক

কৃষি একটি অলাভজনক খাত, এই খাতে জিডিপি কম, শিল্পে বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল খাতে জিডিপি বেশি। তাই কৃষি থেকে সম্পদ বা বাজেট সরিয়ে শিল্প খাতে বিনিয়োগ করলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়বে। রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের প্রায়শই মূলধারার অর্থনীতির এই যুক্তি ব্যবহার করতে দেখা যায়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ২০১৩-১৪ সালের জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিল ১৬.৩৩% (২০০৯-১০-এ যা ছিল জিডিপির ১৮.৩৬%)। অন্যদিকে ২০১৩-১৪ সালের জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ২৯.৬১% (২০০৯-১০-এ যা ছিল ২৬.৭৮%)। বলাই বাহুল্য, জিডিপি বা প্রবৃদ্ধিতে শিল্প খাতের অবদান সংখ্যাগতভাবে কৃষি থেকে বেশি। কিন্তু খাদ্য এবং খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জল, জমি, মানুষের জীবিকা, নদী এবং সর্বোপরি সমাজ, সংস্কৃতি ও স্থানীয় অর্থনীতির রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক, যা প্রবৃদ্ধি বা জিডিপির মাপকাটিতে বিচার করা হয় না। দরিদ্র এবং ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাই উর্বর কৃষিজমি সংরক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে কৃষিজমির একটি বড় অংশ ব্যবহৃত হয় ধান-গমসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশস্য উৎপাদনে। কৃষিজমি ক্রমশ অকৃষি জমিতে রূপান্তর করা হলে খাদ্যশস্য উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস পায় এবং ক্রমবর্ধমান হারে বিশ্ববাজার থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। আর আন্তর্জাতিক বাজারে যেহেতু খাদ্যশস্যের দাম স্থির থাকে না, খরা-যুদ্ধসহ নানা কারণেই খাদ্যশস্যের সংকট তৈরি হতে পারে। সেক্ষেত্রে রফতানিকারক দেশগুলো হঠাৎ ধান বা

গম রপ্তানি বন্ধ করে দিলে খাদ্য নিরাপত্তা মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়াটাই স্বাভাবিক। বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে চাল রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতীয় নিষেধাজ্ঞা এই পরিস্থিতির একটি বড় উদাহরণ।

২০০৮ সালে বিশ্বব্যাপী কৃষি খাতে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল, তার অন্যতম কারণ ছিল কৃষিজমির অযাচিত বাজারমুখী এবং শিল্পভিত্তিক ব্যবহার। বিভিন্ন গবেষণায় ২০০৮ সালে খাদ্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল বিশ্বব্যাপী বিপুল পরিমাণ কৃষিজমিতে প্রধান শস্য (যেমন– চাল, গম, জব, আলু ইত্যাদি) চাষের পরিবর্তে জৈব জ্বালানি, বাজারকেন্দ্রিক খাদ্যপণ্য বা অর্থকরী ফসলের আবাদকে। এদিকে ভারতে গত দুই দশকে প্রায় দুই লাখ কৃষকের আত্মহত্যার মূল কারণ ছিল কৃষিজমিতে খাদ্যশস্যের পরিবর্তে বিটি কটনের মতো অর্থকরী ফসলের আবাদ। সম্প্রতি প্রকাশিত গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সে দেখা গেছে, গত কয়েক বছরে ক্ষুধা ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে এমন প্রতিটি দেশই কৃষি খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ করে খাদ্য ও পুষ্টি খাতে সাফল্য অর্জন করেছে।

কৃষিজমির শিল্পভিত্তিক ব্যবহারের পক্ষে আরেকটি বহুল ব্যবহৃত যুক্তি হলো, কৃষি একটি অরক্ষিত খাত এবং কৃষক বরাবরই খারাপ আবহাওয়া এবং বাজারদরের অনিশ্চিত ওঠানামার মুখে জিম্মি। বছরের পর বছর উৎপাদিত শস্যের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় কৃষকের পক্ষে যেহেতু দারিদ্র্যের চক্র থেকে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। তাই শিল্প খাতের উন্নয়ন এবং বিকাশের মাধ্যমেই এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিশ্চিত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে।

বিভিন্ন গবেষণায় ২০০৮ সালে খাদ্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল বিশ্বব্যাপী বিপুল পরিমাণ কৃষিজমিতে প্রধান শস্য (যেমন– চাল, গম, জব, আলু ইত্যাদি) চাষের পরিবর্তে জৈব জ্বালানি, বাজারকেন্দ্রিক খাদ্যপণ্য বা অর্থকরী ফসলের আবাদকে।

এই যুক্তির বিপরীতে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন শিল্পোন্নত দেশগুলোর কৃষি খাতে বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি দিয়ে আসছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপের মতো শিল্পপ্রধান দেশগুলো কৃষি খাতে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। এ ছাড়াও কৃষিবান্ধব রক্ষণশীল (প্রটেকশনিস্ট) রাষ্ট্রীয় নীতির কারণে এইসব দেশের কৃষি খাতকে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মুখেও পড়তে হয় না। অর্থাৎ শিল্পপ্রধান রাষ্ট্রগুলো পরিকল্পনামাফিক কৃষি খাতে উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের মাধ্যমে এই খাতের সঙ্গে জড়িত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে। এদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কৃষি খাত ক্রমান্বয়ে আরো বেশি অরক্ষিত হয়ে পড়ার মূল কারণ আশির দশকের মাঝামাঝিতে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের পরামর্শ অনুযায়ী অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে কৃষি থেকে ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ও ভর্তুকি প্রত্যাহার। আবার একই সময়ে এদেশে পোশাক খাতসহ অন্যান্য শিল্প খাতের বিকাশ ঘটলে রপ্তানিমুখী শিল্পে সস্তা শ্রমিকের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতেই কৃষি খাতকে পরিকল্পনামাফিক অরক্ষিত করে রাখা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

অর্থাৎ একদিকে কৃষি থেকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা সরিয়ে নিয়ে, অন্যদিকে রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলোর আঁতাতের ফলস্বরূপ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মতো বেসরকারি খাতে বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ চালু রেখে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবেই উন্নয়নশীল দেশের কৃষি খাতকে অবহেলিত করে রাখা হয়েছে। কাজেই কৃষিপণ্যের বাজারদর, কৃষি মজুরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার পেছনে যেমন দায়ী রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, তেমনি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মতো বহুজাতিক বাণিজ্যিক প্রকল্পের তথাকথিত সাফল্যের পেছনে রয়েছে বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি এবং নীতি সহযোগিতা। বাণিজ্যিক শিল্প খাতে দীর্ঘমেয়াদি রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের বিষয়টি সামনে না এনে, কৃষিকে অলাভজনক খাত হিসেবে দেখানোর এই প্রচেষ্টা বাজারমুখী রাষ্ট্রের সঙ্গে মুনাফাকেন্দ্রিক কর্পোরেট হাউসগুলোর আঁতাতমূলক সম্পর্কেরই ফলাফল।

উচ্ছেদের অর্থনীতি

১৯৪৭ সালের পরে স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতে উন্নয়ন প্রকল্পের নামে প্রায় ৬০ মিলিয়ন বা ৬ কোটি কৃষক বাস্তুহারা হয়েছে বলে মনে করা হয়। তবে গত দুই দশকে, বিশেষত ১৯৯০-পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন খাতে বিদেশি বিনিয়োগ এবং পুঁজির প্রবাহ বাড়লে হাইটেক সিটি, নগরায়ণ, বাঁধ, কয়লা খনন প্রকল্প, ভারী শিল্প, আবাসন শিল্প ইত্যাদি খাতে ব্যাপক জমির প্রয়োজন পড়লে কৃষক উচ্ছেদ মারাত্মক আকার ধারণ করে। শুধুমাত্র বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের কারণে উচ্ছেদকৃত কৃষকের সংখ্যা সরকারি কোনো পরিসংখ্যানে না থাকলেও বিভিন্ন সূত্রে গত দুই দশকে প্রায় সাড়ে চার কোটি কৃষক এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ উচ্ছেদের প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নামে এই বিপুলসংখ্যক মানুষের উচ্ছেদ এটাই প্রমাণ করে যে, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের এই মডেল মূলত উন্নয়নের নামে প্রান্তিক মানুষের সম্পদ ব্যবসায়ি শ্রেণি এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলোর হাতে স্থানান্তর করারই একটি প্রক্রিয়া, যা দুই দশকে ভারতে ধনী-গরিবের বৈষম্য বাড়িয়েছে বহুগুণ।

পরিশেষ

২০১০ সালে বাংলাদেশ সরকার অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন বা 'ইকোনমিক জোন অ্যাক্ট-২০১০' অনুমোদনের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট সাতটি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বলাই বাহুল্য, এইসব অঞ্চল বহুমুখী রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার আওতায় থাকবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে জমির প্রাপ্যতা। সে কারণেই সাম্প্রতিক বাজেটে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। সরকারের এই তড়িঘড়ি পদক্ষেপ থেকে বোঝা যায়, যে কোনো মূল্যে জমি অধিগ্রহণ করে বাণিজ্যিক কোম্পানিকে বিশেষ অঞ্চলের সুবিধা দিতে বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই বদ্ধপরিকর। অথচ ভারতের অভিজ্ঞতা বলে, কৃষি অধ্যুষিত এলাকায় জোরপূর্বক ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করার প্রচেষ্টা বাংলাদেশের মতো কৃষিপ্রধান দেশের কৃষি খাত এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হবে মারাত্মক বিপর্যয়কর। শুধু তা-ই নয়, তথাকথিত এই 'উন্নয়ন' মডেল কেবল কর্পোরেট হাউসগুলোর মুনাফা তৈরির কেন্দ্র হিসেবেই ব্যবহৃত হবে; অন্যদিকে উচ্ছেদ হবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বাড়বে ধনী-গরিবের বৈষম্য।

লেখক: গবেষক

ইমেইল: maha.z.mirza@gmail.com

তথ্যসূত্র:

[টাইমস অব ইন্ডিয়া, ২০১৪] Times of India (2014), "Govt approves ordinance to ease Land Acquisition Act to push reforms", Dec 29, retrived from http://timesofindia.indiatimes.com/india/Govt-approves-ordinance-to-ease-Land-Acquisition-Act-to-push-reforms/articleshow/45678103.cms

[লেভিন, ২০১২] Levien, Michael (2012), "The Politics of Dispossession: Theorizing India's "Land Wars"", paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing II, organized by the Land Deals Politics Initiative (LDPI) and hosted by the Department of Development Sociology at Cornell University, Ithaca, NY. October 17-19.

[সুন্দারাপান্দিয়ান, ২০১২] Soundarapandian, Mookkiah (2012), Development of Special Economic Zones in India: Impact and implications, New Delhi: Concept Publishing Company.